ঐতিহাসিক সাহিত্য—প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সাহিত্য, বিদেশীদের বিবরণী, লেখ, মুদ্রা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তুলনায় দিল্লি সুলতানির ইতিহাসের উপাদান বিশাল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য এবং গুণগতমানে উন্নত। মুসলমান ঐতিহাসিকরা সমকালীন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। এইসব ইতিহাসে স্থান, কাল, পাত্রের বর্ণনা আছে, আছে কালানুক্রম, রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর পরিচয়। সুলতানির ইতিহাস যেমন লেখা হয়েছে তেমনি এযুগে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাসও রচিত হয়েছে। লিখিত আকর ছাড়াও আছে স্থাপত্য নিদর্শন, মুদ্রা, লেখ ও কিছু দলিল-দস্তাবেজ। বিদেশী পর্যটকরা ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তাঁরা এদেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন। সুলতানি যুগে নির্মিত অসংখ্য প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, মাদ্রাসা, খান্‌কা ও স্মৃতিসৌধ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয়। সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য চারভাগে ভাগ করা যায়—(ক) সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস, (খ) প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস, (গ) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী এবং (ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য, মুদ্রা, লেখ, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি।

ক. সমসাময়িক ইতিহাস

তুর্কি মুসলমানরা ভারত জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস রচনার ধারাটিও সঙ্গে করে এনেছিল। সিন্ধুদেশে আরব শাসনের শুরু থেকে মুসলমান শাসনের শেষ অবধি মুসলমান ঐতিহাসিকরা এর ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন। ইবনাল আসীরের *কামিলাৎ-তারিখ* (১২৩০) গ্রন্থখানি মহম্মদ ঘুরির বংশ পরিচয় এবং মধ্য এশিয়া সম্পর্কে বহু তথ্য সরবরাহ করে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত তারিখগুলি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। কামিলাৎ-তারিখের পরিপূরক গ্রন্থ হলো আতামালিক জুয়াইনির *তারিখ-ই-জাহান গুসা-ই-জুয়াইনি* (১২৬০)। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে এতে পাওয়া যায় পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের ইতিহাস। লেখক মোঙ্গল নেতা হলাকুর অধীনে উচ্চপদে ছিলেন। সমকালীন ঘটনাবলীর তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ দর্শক, তবে তাঁর লেখায় কিছুটা পক্ষপাতিত্ব এসেছে। হামদুল্লা মাস্তোকি কাজবিনী লেখেন

তারিখ-ই-গাজীদা (১৩২৯)। গজনি, ঘুর ও ভারতের সুলতানদের সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য তথ্য এতে আছে। আরবদের সিন্ধুবিজয় সম্পর্কে প্রাথমিক আকর গ্রন্থ হলো আরবি ভাষায় লেখা *চাচনামা*। মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধুবিজয়ের কথা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। মহম্মদ আলি বিন কুফী এই গ্রন্থখানির ফারসি অনুবাদ করেন। সিন্ধু জয়ের ওপর আরও একখানি গ্রন্থ পরবর্তীকালে লিখেছিলেন মীর মহম্মদ মাসুম, *তারিখ-ই-সিন্ধ* ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। আবু নাসের বিন উতবি লেখেন ইয়ামিনি রাজবংশের ইতিহাস *কিতাবুল ইয়ামিনি*। এতে সবুক্তিগিন ও মামুদের ইতিহাস আছে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মামুদের জীবনীর ওপর আরও একখানি গ্রন্থ হলো আবুল ফজল বৈহাকির *তারিখ-ই-মামুদী*।

হাসান নিজামীর *তাজ-উল-মাসির* হলো দিল্লি সুলতানির আদিপর্বের ইতিহাস (১১৯২-১২২৮)। দিল্লি সুলতানির প্রথম পর্বের আর একজন ঐতিহাসিক হলেন মিনহাজ-উস-সিরাজ। তাঁর *তবাকৎ-ই-নাসিরীতে* (১২৬০) ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানির ইতিহাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন তথ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এই বিচারক-ঐতিহাসিক ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে মুসলমান শাসকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ আছে। মহম্মদ ঘুরির ভারত অভিযান ও ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খল্‌জির বাংলা জয়ের কাহিনী এতে পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কথা নেই। সমকালীন বহু ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন কিন্তু পক্ষপাতশূন্যভাবে নিরপেক্ষ ইতিহাস তিনি লিখতে পারেননি। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫)। কায়কোবাদ, জালালুদ্দিন খল্‌জি, আলাউদ্দিন, মুবারক খল্‌জি ও গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেন। তাঁর পুরো নাম হলো আবুল হাসান আমিনউদ্দিন খুসরভ। প্রধানত কবি, হিন্দুস্তানের তোতাপাখি, খসরু গদ্যে ও পদ্যে বহু ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থ লেখেন। তাঁর মসনবি ও দিবানগুলি হলো ইতিহাসনির্ভর। তাঁর রচনার মধ্যে আছে *কিরান-উস-সাদিন, মিফতা-উল-ফুতু, আশিকা, নু-সিপিহর* ও *তুঘলকনামা*। এগুলি হলো সব কাব্যগ্রন্থ, তবে ইতিহাসের উপাদান আছে। গদ্যে তিনি লিখেছেন ঐতিহাসিক গ্রন্থ *খাজাইনুল ফুতুহ* (তারিখ-ই-আলাই)। এই ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় আলাউদ্দিনের রাজত্বের প্রথম ষোলো বছরের তথ্য এবং দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কাহিনী। সমকালীন দেশের কথা ও সমাজের পরিচয় দিতে কবি-ঐতিহাসিক ভুল করেননি। তবে মনে রাখা দরকার তিনি প্রথমে ছিলেন কবি, পরে ঐতিহাসিক (he writes more as a poet than as a professional historian)।[১]

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *দিল্লি সুলতানাত*, পৃ. ২।

বারানি হলেন সুলতানি যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তাঁর বিখ্যাত রচনা *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*-তে (১৩৫৮) তিনি চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সুলতানি রাজত্বের ইতিহাস লিখেছেন। উলেমা সম্প্রদায়ের মানুষ বারানি ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন (Barani had high conception of a historian and considered it to be his essential duty to record honestly the whole truth.)। সত্য প্রকাশ করা হলো ঐতিহাসিকের ধর্ম, বারানি ঐতিহাসিকের এই ধর্ম পালন করেননি। প্রথম কারণ হলো তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের দোষত্রুটির কথা প্রকাশ করেননি। এই ত্রুটি আমীর খসরুর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। খসরু আলাউদ্দিনের নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা এড়িয়ে গেছেন। বারানিও তাই করেছেন। ইলিয়ট তাঁকে 'অসত্যভাষী' (unfair narrator) বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ফিরিস্তা তাঁর বিরুদ্ধে সত্য গোপন করার অভিযোগ এনেছেন (Firishta blames Barani for withholding the truth.)। বারানি ছিলেন দরবারী ঐতিহাসিক, তিনি দরবারের কাগজপত্র দেখেছিলেন। অথচ তাঁর বর্ণনায় ঐতিহাসিক কালানুক্রম রক্ষা করেননি, তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত তারিখ ও স্থানগুলির পরিচয় বেশ ত্রুটিপূর্ণ (he is very sparing and inaccurate in his dates)। বারানির ইতিহাস পদ্ধতিও ছিল বেশ ত্রুটিপূর্ণ (He is also wanting in method and arrangement.)। গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডিসের মতো তিনি নায়কদের মুখে সংলাপ বসিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি*-তে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রশাসন, আদর্শ ও আইন-কানুনের কথা আছে। বারানির ইতিহাসে সুলতানি যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি যত্ন করে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, উৎপাদন, বাজার দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন।

মিনহাজ ও বারানি ছাড়া সুলতানি যুগের আরও কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন ইসামী, শামস-ই-সিরাজ আফিফ ও ইয়াহিয়া সরহিন্দি। ইসামীর *ফুতু-উস-সালাতিন* (১৩৫০) শাহ্‌নামার মডেলে রচিত হয়। গজনির ইয়ামিনি রাজবংশের ইতিহাস থেকে শুরু করে তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব পর্যন্ত ইতিহাস লিখেছেন। তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের অত্যাচারের শিকার হন। বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেন। ইসামী ঐ যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, এতে ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বের ইতিহাস আছে। বারানি যেখানে শেষ করেছেন আফিফ সেখানে শুরু করেছেন। ইয়াহিয়া সরহিন্দের *তারিখ-ই-মুবারকশাহী*-তে মহম্মদ ঘুরি থেকে সৈয়দবংশের শেষপর্যন্ত সমগ্র সুলতানি যুগের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। আফিফের বর্ণনায় যেসব ত্রুটি আছে সরহিন্দের লেখা থেকে তা দূর করা যায়। আহম্মদ ইয়াদগার *তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগান*

গ্রন্থে লোদীদের ইতিহাস লিখেছেন। নিয়ামতুল্লাহর *মাঘজান-ই-আফগান* এবং আবদুল্লার *তারিখ-ই-দাউদী* হলো শূর ও লোদী বংশের নির্ভরযোগ্য উপাদান। নিজামুদ্দিন ও ফিরিস্তা সুলতানি যুগ সম্পর্কে বহু তথ্য সরবরাহ করেছেন।

ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বের একখানি নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ হলো সুলতানের নিজের আত্মজীবনী *ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী*। ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাখানি সুলতানের মানসিকতার পরিচয় বহন করে। *সিরাত-ই-ফিরুজশাহী* (১৩৭০) নামে আরও একখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে লেখকের নাম জানা যায় না। *ওয়ালিয়াৎ-ই-মুস্তাকি* ও *তারিখ-ই-মুস্তাকি* নামে দুখানি পাণ্ডুলিপির কথা জানা যায়। এগুলির লেখক হলেন শেখ রিজকুল্লাহ্ (১৪৯১-১৫৮১), তিনি মুস্তাকি নামে লিখতেন। ইনি লোদী ও শূরদের সমসাময়িক ইতিহাস লিখেছেন। নিজামুদ্দিন ও ফিরিস্তা সুলতানি আমলের প্রদেশগুলির ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য রেখে গেছেন। প্রদেশগুলির পৃথক ইতিহাস লেখা হয়েছে, *তারিখ-ই-বাহাদুরশাহী* হলো সিন্ধু প্রদেশের ইতিহাস। এই গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না, তবে নিজামুদ্দিন, আবুল ফজল ও ফিরিস্তা এই গ্রন্থখানিকে ব্যবহার করে গ্রন্থ লিখেছেন। মীর মহম্মদ মাসুম লিখেছেন *তারিখ-ই-সিন্ধ* (১৬০০)। মীর তাহির মহম্মদ নিসইয়ানি লিখেছেন *তারিখ-ই-তাহিরি* (১৬৪৪-৫৫), আলি শেরকানি সিন্ধুর ওপর লিখেছেন *তুফাৎ-উল-কিরম*। সিন্ধু হলো মুসলমানদের অধিকৃত প্রথম ভারতীয় প্রদেশ, এজন্য এবিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেশি। কাশ্মীরী অভিজাত হায়দার মালিক *তারিখ-ই-কাশ্মীর* (১৫৭৮) গ্রন্থে কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস দিয়েছেন। রাজতরঙ্গিণী অনুসরণ করে তিনি এই ইতিহাস লিখেছেন। *তারিখ-ই-রশিদী* হলো মির্জা হায়দার দুঘলাতের রচিত ইতিহাস, এখানি ছিল *রাজতরঙ্গিণী*-র পরিপূরক গ্রন্থ।

খ. প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস

শুধু সিন্ধু ও কাশ্মীরের নয়, অন্যান্য প্রদেশের বিস্তৃত ইতিহাস আছে। বাংলার ইতিহাস লিখেছেন গোলাম হোসেন সলিম, তাঁর গ্রন্থের নাম হলো *রিয়াজ-উস-সালাতিন*। বখতিয়ার খলজির আক্রমণ থেকে শুরু করে তিনি ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস লিখেছেন। এই গ্রন্থের অনেক ত্রুটি আছে। স্যার যদুনাথ বলেছেন যে এই গ্রন্থখানিতে তথ্য কম, তারিখ ও বর্ণনায় ত্রুটি আছে, শিথিল ঐতিহ্যের ওপর তিনি নির্ভর করেছেন, ফার্সি ভাষায় লিখিত আকরগুলি তিনি দেখেননি (This book, named the Riyaz-us-Salatin, is meagre in facts, mostly incorrect in detail and dates, and vitiated by loose traditions, as its author had no knowledge of many of the standard Persian authorities who had treated of Bengal as part of their general histories of India.)। সিকান্দর বিন মুহম্মদ লিখেছেন *মিরাত-ই-সিকান্দরি*, মুসলমান বিজয় থেকে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এতে গুজরাটের ইতিহাস পাওয়া যায়। আলি মহম্মদ খানের *মিরাত-ই-আহম্মদী* (১৭৫৬-৬১) হলো গুজরাটের আরও একখানি ইতিহাস। মীর আবু তোরাব ওয়ালি লিখেছেন *তারিখ-ই-গুজরাট*। আরবি ভাষায় গুজরাটের ইতিহাস লিখেছেন আবদুল্লাহ মুহম্মদ বিন ওমর আলমাক্কি।

সৈয়দ আলি তবতবা লিখেছেন *বুরহান-ই-মাসীর*, এই গ্রন্থখানি হলো গুলবর্গা ও বিদরের বাহমনি এবং আহম্মদনগরের নিজামশাহী রাজবংশের ইতিহাস। এই গ্রন্থ রচনায় লেখক ইসামীর *ফুতু-উস-সালাতিন* থেকে অনেক তথ্য নিয়েছেন। রফিউদ্দিন সিরাজী লিখেছেন *তাজকিরাত-উল-মুলুক*—বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের ইতিহাস। দ্বাদশ শতক থেকে আকবরের কাশ্মীর জয় পর্যন্ত ইতিহাস জানতে হলে তিনখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হয়। জনরাজ এধরনের একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, মুসলমান ঐতিহাসিকরা এগুলির ওপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখেছেন। বিদেশীরা বিজয়নগরের ইতিহাসের জন্য অনেক উপাদান রেখে গেছেন। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় *আমুক্তমাল্যদা* গ্রন্থে এই রাজ্যের রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সভাকবি পেদ্দন এই রাজ্যের কথা কাব্যে উল্লেখ করেছেন। বিজয়নগরের রাজপুত্র কম্পনের বিদুষী স্ত্রী গঙ্গাদেবী লিখেছেন সুন্দর একখানি ঐতিহাসিক কাব্য *মাদুরাবিজয়ম*। রাজনাথ লিখেছেন *অচ্যুতরায়ভ্যুদয়* নামে ইতিহাসাশ্রিত একখানি গ্রন্থ, বিজয়নগরের ইতিহাস রচনায় তা সহায়ক হয়। প্রাদেশিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো চারণকবিদের গাথাগুলি। চাঁদ বরদাই লিখেছেন *পৃথ্বিরাজ রসো*, এর থেকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজস্থানের খত্ সাহিত্য, আসামের 'বুরাঞ্জি' সাহিত্য, মহারাষ্ট্রের 'বখর' সাহিত্য, পাঞ্জাবের 'জনমসখী', ওড়িশার 'মাদলা-পঞ্জিকা' থেকে কিছু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা যায়। তবে এখানে জনশ্রুতি, প্রবাদ, ইতিহাস এমনভাবে মিশে আছে যে ঐতিহাসিককে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি বড় আকর হলো বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্যের জীবনী সাহিত্য, সুফিদের রচিত গ্রন্থ, কবীরের দোহা ও মীরা বাঈয়ের ভক্তিগীতি। সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় এসব উপাদানকে অগ্রাহ্য করা যায় না। কবি আমীর খসরু তাঁর গুরু নিজামুদ্দিনের কথা লিখে গেছেন।

গ. বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী

এপর্বে ভারতে এসেছিলেন বহু বিদেশী পর্যটক। এঁদের রেখে যাওয়া বিবরণী হলো মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক প্রাথমিক উপাদান। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নামটি হলো ইবন বতুতা (১৩০৪-৭৮)। তাঁর পারিবারিক নাম হলো বতুতা, আসল নাম হলো আবু আবদুল্লাহ মহম্মদ। তিনি বহু দেশ ঘুরেছিলেন, বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছিলেন। তিনি প্রায় চোদ্দ বছর (১৩৩৩-৪৭) ভারতে কাটিয়েছিলেন, তার মধ্যে আট বছর দিল্লিতে ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে কাজী ও সরকারের নানা উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। সুলতান কোনো কারণে তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, পরে তাঁকে মুক্তি দেন। সুলতান তাঁকে উচ্চপদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি, তিনি সুলতানের দূত হিসেবে চীনে যেতে রাজি হন। বাংলা থেকে জাহাজে চড়ে সুমাত্রা ও জাভা হয়ে তিনি চীনে পৌঁছেছিলেন। ইবন বতুতার *রেহলা* (Rehla) হলো বহু ঐতিহাসিক তথ্যের আকর। সেযুগের বহু রাজনৈতিক ঘটনার কথা যেমন এতে আছে তেমনি আছে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা। ভারতের রাস্তাঘাট, পরিবহন, ডাকব্যবস্থা, গোয়েন্দা বিভাগ, সেযুগের মানুষের চিন্তাভাবনা, কৃষিজ উৎপাদন, রাজসভা, রাজসভার অনুষ্ঠান, বাণিজ্য, জাহাজ পরিবহন, সঙ্গীত ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কে তিনি হলেন তথ্যের আকর। তিনি সুলতানকে কাছ থেকে দেখেছিলেন, মধ্যযুগের এই জটিল চরিত্রের মূল্যায়নে ইবন বতুতা হলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আকর। প্রথমত, তিনি ছিলেন বিদেশী, দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন। সুলতানের অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে তাঁকে লিখতে হয়নি। নির্ভয়ে মোহমুক্ত মন নিয়ে তিনি ভারতের কথা লিখেছেন। ইবন বতুতার পক্ষে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়েছে। সত্যকে জানার ও প্রকাশ করার মতো মানসিকতা এবং সুযোগ তাঁর ছিল। অল কালকাসন্দি চতুর্দশ শতকে লিখেছিলেন *সুভ-উল-আশা* নামে একখানি গ্রন্থ। এই লেখক কখনো ভারতে আসেননি, তিনি ভারত ভ্রমণকারী বিদেশী ও ভূগোলবিদ্‌দের সরবরাহ করা তথ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর ইতিহাস লিখেছিলেন। পারস্যদেশীয় দূত আবদুর রজ্জাক ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে কালিকটের সামোরিনের (Zamorin of Calicut) রাজসভায় এসেছিলেন। এখান থেকে বিজয়নগরে এসে তিনি ঐ রাজ্যের শাসন, সমাজ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ রেখে গেছেন।

এই পর্বে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষে ফ্রান্সিসক্যান সন্ন্যাসী জন ও মার্কোপোলো ভারতে এসেছিলেন। চীন থেকে পারস্য হয়ে ভেনিস যাওয়ার পথে মার্কোপোলো দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর এক সহকর্মীর কাছে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, সেই বর্ণনা ভ্রমণকাহিনীর রূপ নিয়েছে। তিনি দক্ষিণ ভারতের সমসাময়িক ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিকোলো কন্টি বিজয়নগরে এসেছিলেন, তাঁর লেখায় বিজয়নগরের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর আলবুকুয়ার্ক রাজা মানুয়েলকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাঁর পুত্র সেগুলি সম্পাদনা করেছেন। গুজরাটের সুলতান এবং পর্তুগীজদের মধ্যে সম্পর্কের কথা এতে পাওয়া যায়। রুশ বণিক নিকিতিন ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাহমনি রাজ্যে এসেছিলেন। ইতালীয় লুদোভিকো দ্য বার্থেমা (১৫০২-০৬), পর্তুগীজ দুয়ার্তে বারবোসা (১৫০০-১৬) এবং ডমিংগো পেজ (১৫০০-০২) বিজয়নগর পরিভ্রমণ করে তাঁদের বর্ণনা রেখে গেছেন। নুনিজ বিজয়নগরের রাজস্বব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘ. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

সুলতানি যুগের লেখ ও মুদ্রা হলো এযুগের ইতিহাসের আর একটি বড় উপাদান। দক্ষিণ ভারতের রাজারা অনেক লেখ রেখে গেছেন। সুলতানদের মুদ্রার সাহায্য নিয়ে কালানুক্রম, সুলতানদের তারিখ এবং তাঁদের রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা যায়। ওড়িশা, দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের লেখ থেকে শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনার ত্রুটিগুলি এইসব লেখ থেকে সংশোধন করা যায়। এডওয়ার্ড টমাস দিল্লির পাঠান শাসকদের মুদ্রার বিস্তৃত বর্ণনা রেখেছেন। বিভিন্ন জাদুঘরে এসব মুদ্রা সংরক্ষিত আছে, এগুলি এযুগের ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য উপাদান। লেনপুল মনে করেন যে মধ্যযুগের সুলতানদের সঠিক ইতিহাস তাঁদের মুদ্রায় ধরা পড়েছে। এই মুদ্রাগুলি সেইসব তথ্য সরবরাহ করে যেগুলি সাধারণত ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে যান। সিংহাসন আরোহণের তারিখ, রাজ্যসীমা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, ধর্মগুরুর সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি তথ্য মুদ্রা থেকে পাওয়া যায় (As a rule we may look upon Muhammedan coins as the surest foundation for an exact history of the dynasties by which they were issued. The coins of a Muslim ruler generally go far to establish those outward data in regard to his reign which oriental historians too often neglect or mis-state. The year of accession, the extent of his dominion, his relations with neighbouring powers and with the spiritual chief of his religion are all facts for which we may look with confidence to his coins.)। বিজয়নগর রাজ্যের রাজাদের প্যাগোডা (pagoda) এবং মাদুরা এবং বাহমনি সুলতানদের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। মাদুরা ও বাহমনি সুলতানদের মুদ্রাগুলি দিল্লির সুলতানদের ধাঁচে তৈরি হয়েছে। সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদান হলো বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। বহু নিদর্শন যেমন প্রাসাদ, দুর্গ, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ, খান্‌কা ইত্যাদি অক্ষত আছে, বহু নিদর্শন নষ্ট হয়েছে। এগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানের ঐতিহাসিক এগুলি নিজে দেখে সুলতানি যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের মূল্যায়ন করেন।

সুলতানি যুগে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকাংশ ইতিহাস লেখা হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক হয় উচ্চপদে ছিলেন অথবা সুলতানের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমীর খসরু সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, জিয়াউদ্দিন বারানি ফিরুজ তুঘলকের দাক্ষিণ্য লাভ করেন। এজন্য এঁদের পক্ষে নির্ভয়ে পক্ষপাতশূন্য হয়ে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। এঁদের রচিত অধিকাংশ ইতিহাসে দেখা যায় ঐতিহাসিক তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের প্রশংসা করছেন। পরবর্তীকালের অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে প্রমাণ করা যায় ঐসব সুলতান একেবারে নিষ্কলঙ্ক বা ত্রুটিহীন ছিলেন না। আমীর খসরু আলাউদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা বা নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ দরবারী ঐতিহাসিক নির্মোহ বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে ইতিহাসের ঘটনাবলী বিচার করতে পারেননি। এজন্য বর্তমানকালের ঐতিহাসিককে খুব সতর্কভাবে এইসব দরবারী ইতিহাস ব্যবহার করতে হয়। অন্যান্য উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে হয়।

সুলতানি যুগের ইতিহাসের আর একটি বড় ত্রুটি হলো সব ঐতিহাসিক তাঁদের বর্ণনায় রাজনীতি, সামরিক অভিযান ও প্রশাসনিক নিয়মরীতির ওপর জোর দিয়েছেন। বেশিরভাগ রচনায় পাওয়া যায় যুদ্ধের কথা, সাম্রাজ্য বিস্তার, বিদ্রোহ বা রাজনৈতিক ঘটনাবলী। দরবারের ইতিহাস পড়লে মনে হয় সেযুগে রাজদরবার ও সমর শিবিরের বাইরে বর্ণনার আর কোনো বিষয়বস্তু ছিল না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি এঁদের রচনায় স্থান পায়নি। যেটুকু সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কথা আছে তা একান্তই গৌণ, বর্ণনায় এসব মুখ্য স্থান পায়নি। ব্যতিক্রম হলেন বারানি, তিনি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য সরবরাহ করেছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। দরবারী ঐতিহাসিকদের সীমাবদ্ধ রচনার জন্য মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে আধুনিককালে জ্ঞান সীমিত হয়ে আছে।

দরবারী ইতিহাসের আর একটি বড় ত্রুটি হলো লেখকেরা ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস লিখতে পারেননি। এঁদের লেখায় ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে, বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মধ্যযুগের ইতিহাস। ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। এযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বারানি এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। তিনি সুলতানকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে বলেছেন। এসব ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় মধ্যযুগের ঐতিহাসিক অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মানবজীবন বা ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে উদার মানবিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে ইতিহাসচর্চা করে এক সুবিশাল

ইতিহাস সাহিত্য তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন। তাঁদের রেখে যাওয়া প্রাথমিক উপাদানের সঙ্গে আধুনিককালে অন্যান্য উপাদান মিলিয়ে সুলতানি যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে।